ও৩ম্

মহাত্মা হংসরাজ

জীবনী ও চিন্তাধারা

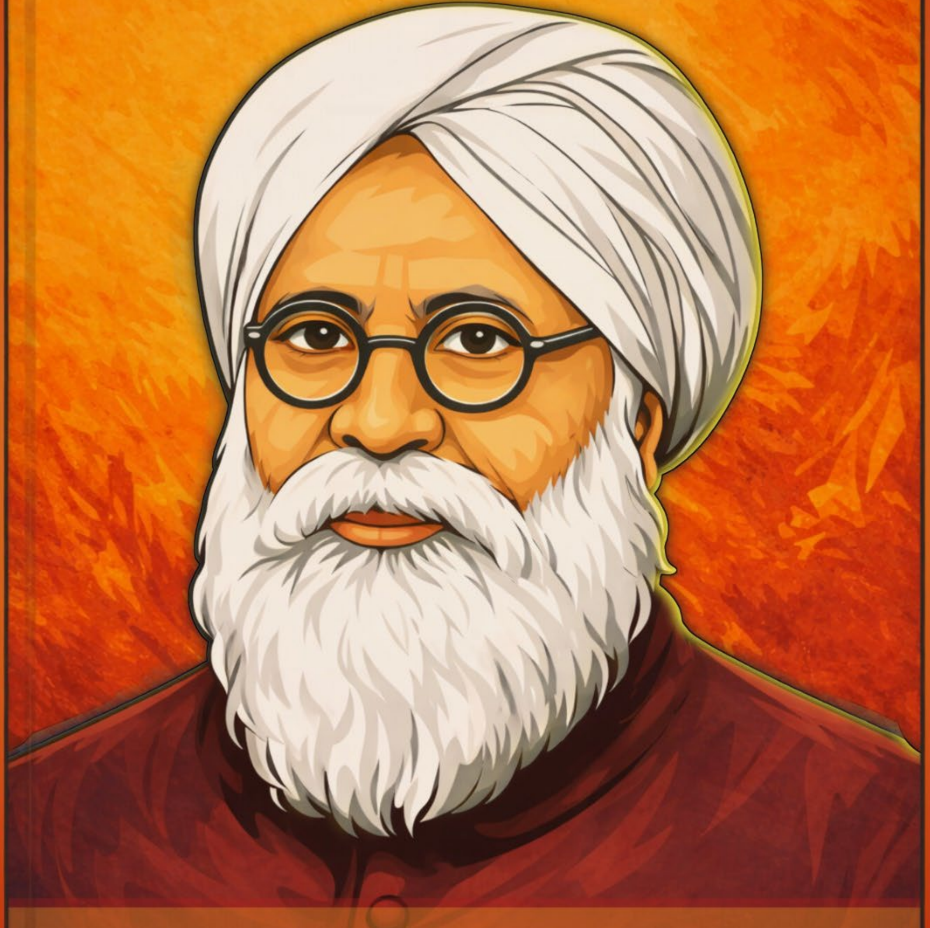

লেখক: প্রফেসর বেদব্যাস

VEDIC QUEST

গ্রন্থ

মহাত্মা হংসরাজ

জীবনী ও চিন্তাধারা

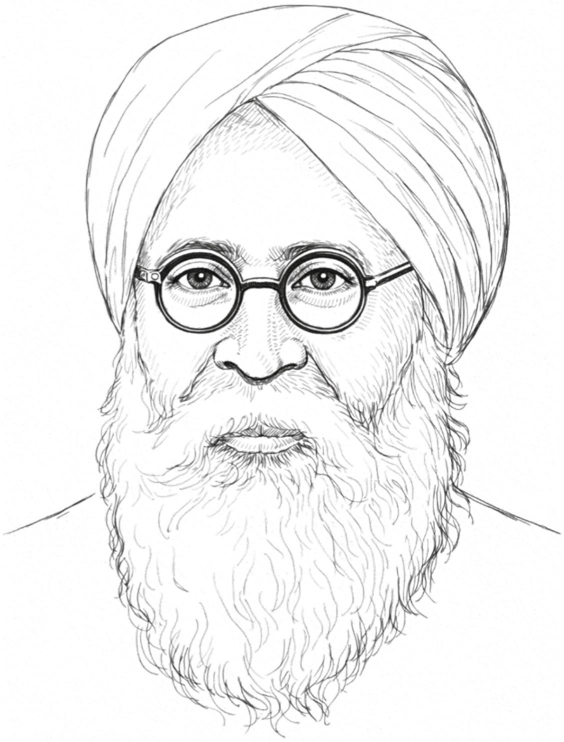

মূল লেখকঃ প্রফেসর বেদব্যাস

অনুবাদকঃ আর্য পথিক

VEDIC QUEST

প্রকাশক: Vedic Quest

Facebook link: https://www.facebook.com/vedicq?mibextid=ZbWKwL

অনুবাদক: আর্য পথিক

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

প্রথম সংস্করণ:

২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ।

৮ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ।

সম্পাদক:

শ্রী উৎসব চন্দ্র শীল

সহযোগীতায়:

১. শ্রী অনির্বান সরকার

২. শ্রী অর্ণব কান্তি মন্ডল অঞ্জন

প্রচ্ছদ: আর্য পথিক

[Vedic Quest এর অনুমতি ব্যতিরেকে বইটির কোনো অংশ বা সম্পূর্ণ অংশ কোনো প্রকার বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে মুদ্রণ, ফটোকপি বা ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে মূল পিডিএফ এডিট করে নিজের নামে প্রচার করা অপরাধ বলে বিবেচিত হবে]

উৎসর্গ

"বেদ উদ্ধারক, সকলকে বেদের পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসার দৃঢ় কণ্ঠস্বর–
মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী জি-কে, এই গ্রন্থ উৎসর্গ।"

অনুবাদকের নিবেদন

মহাত্মা হংসরাজ ছিলেন একাধারে একজন মহান শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক এবং ত্যাগের মূর্ত প্রতীক। ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বিশেষ করে ডি.এ.ভি. (Dayanand Anglo-Vedic) স্কুল ও কলেজ আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি যে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন, তা আজও অম্লান। **"মহাত্মা হংসরাজ: জীবনী ও চিন্তাধারা"** বইটি কেবল একটি সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনি নয়, বরং এটি মহাত্মাজির আমাদের আর্য সমাজীদের প্রতি উপদেশ এবং তার অনুপ্রেরণামূলক চিন্তাধারার এক অনন্য দলিল।

আমার জন্য এই বইটি অনুবাদ করা ছিল এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। তাঁর জীবন ও আদর্শকে বাঙালি পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার তাগিদ থেকেই এই অনুবাদে হাত দেওয়া। অনুবাদ করার সময় আমি মূল রচনার ভাব ও মহাত্মা হংসরাজের আদর্শিক দর্শনকে অক্ষুণ্ণ রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। তবুও, এক ভাষার শব্দ ও আবেগ অন্য ভাষায় হুবহু রূপান্তর করা বেশ চ্যালেঞ্জিং। এই ভাষান্তরের মাধ্যমে যদি পাঠকরা মহাত্মা হংসরাজের সুমহান জীবনদর্শন সম্পর্কে কিছুটা হলেও জানতে পারেন, তবেই আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।

বইটি প্রকাশনার ক্ষেত্রে যারা বিভিন্নভাবে পরামর্শ এবং উৎসাহ দিয়ে সাহায্য করেছেন, তাদের সকলের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বানান বা তথ্যগত কোনো অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটি থেকে থাকলে আশা করি পাঠক তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। পাঠকদের গঠনমূলক পরামর্শ পরবর্তী সংস্করণে সাদরে গ্রহণ করা হবে।

ইতি,

আর্য পথিক

২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

৮ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকের নিবেদন

"মহাত্মা হংসরাজ: জীবনী ও চিন্তাধারা" গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি যখন আমার হাতে আসে, তখনই এর বিষয়বস্তুর গভীরতা আমাকে মুগ্ধ করে। অনুবাদক আর্য পথিক অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে মূল ভাব অক্ষুণ্ন রেখে এটি বাংলায় রূপান্তর করেছেন।

উক্ত গ্রন্থে বিশেষ কিছু প্রসঙ্গ উপস্থাপন করা হয়েছে যা প্রত্যেক আর্য সমাজীর অবগত হওয়া উচিত। যারা সামাজিক পরিস্থিতির ভয়ে নিজেকে আর্য সমাজী হিসেবে প্রকাশ করতে সংকোচ বোধ করে, তাদেরকে সাহস যোগাতে চেয়েছেন মহাত্মা হংসরাজ জি। সন্ধ্যোপাসনা, স্বাধ্যায়, সৎসঙ্গ, সংগ্রাম, আত্মসমালোচনাদি উত্তম ভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এই গ্রন্থে। নিজ জীবনের সাথেও এই গ্রন্থের অনেক উক্তির সাদৃশ্য অনুভব করেছি, যা প্রশংসনীয়। সামান্য কিছু পৃষ্ঠায় আবদ্ধ মহৎ জ্ঞানের সার রূপে এই গ্রন্থের জুড়ি মেলা ভার। যারা বৃহদাকার শাস্ত্র গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করতে ভয় অনুভব করেন, তারা একবার এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থখানা পাঠ করলে নিজ নিজ চিন্তাধারায় ইতিবাচক পরিবর্তন অনুভব করতে সক্ষম হবেন।

সম্পাদক হিসেবে আমার মূল লক্ষ্য ছিল—অনুবাদটি যেন কেবল শব্দের রূপান্তর না হয়ে বরং সাবলীল একটি পাঠ অভিজ্ঞতা হয়। দীর্ঘ জটিল বাক্যগুলোকে ভেঙে সহজ করা এবং কিছু স্থানে মূল প্রেক্ষাপট স্পষ্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় টীকা যুক্ত করা হয়েছে। আশা করি, বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে এই সংস্করণটি মূল বইয়ের স্বাদ বজায় রেখেই সমাদৃত হবে। এমন আকর্ষণীয় গ্রন্থ জনস্বার্থে প্রকাশ ও প্রচার করার জন্য সম্মানিত রচয়িতা এবং অনুবাদক মহোদয়ের প্রতি অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

ইতি,

শ্রী উৎসব চন্দ্র শীল

২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

৮ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সূচিপত্র

১। সংক্ষিপ্ত জীবনী - পৃষ্ঠা (৮-১১)

২। অনুপ্রেরণামূলক চিন্তাধারা - পৃষ্ঠা (১২-৩২)

ओ३म्

মহাত্মা হংসরাজ

মহাত্মা হংসরাজ একটি সম্মানিত মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নিজের বড় ভাই শ্রী মূলখরাজ-এর আর্থিক সহায়তায় তিনি তাঁর স্কুল ও কলেজের শিক্ষা সম্পন্ন করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। সেই সময়ে স্নাতকদের জন্য উচ্চ বেতন এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করে এমন উচ্চপদস্থ সরকারি চাকুরিতে নিযুক্ত হওয়া মোটেও কঠিন ছিল না। কিন্তু যুবক হংসরাজ আরাম ও বিলাসিতার পরিবর্তে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যকে বরণ করে প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের ন্যায় নিজের জীবন সমাজসেবায় উৎসর্গ করার সংকল্প গ্রহণ করেন। আর্য সমাজের মহান প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দয়ানন্দের তিরোধান ঘটেছিল ১৮৮৩ সালের নভেম্বর মাসে। তাঁর উপদেশসমূহের গভীর প্রভাব পাঞ্জাবের ওপর পরিলক্ষিত হয়েছিল। তাঁর দেহাবসানের মাত্র কয়েক দিন পরেই পাঞ্জাবের আর্য সমাজীরা তাঁর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মানুষের মাঝে উৎসাহের কোনো কমতি ছিল না এবং এই মহান কার্যের নিমিত্তে চতুর্দিক থেকে সাহায্য আসতে শুরু করে। তবুও এটি অনুমান করা হয়েছিল যে, একটি উচ্চ বিদ্যালয় (হাই স্কুল) নির্মাণের জন্য আট লক্ষ রুপি সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু সমস্ত প্রচেষ্টার পর সংস্থাটি ছয় মাসে মাত্র ২৭,০০০/- রুপি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। স্বাভাবিকভাবেই সংগঠনকর্তারা অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েন। এই চরম সংকটের মুহূর্তে যুবক হংসরাজ ‘দয়ানন্দ অ্যাংলো বৈদিক’ শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে নিজের সম্পূর্ণ জীবন অবৈতনিক (বিনা বেতনে) ভাবে সেবা প্রদানের জন্য উৎসর্গ করেন। এই ত্যাগদীপ্ত আত্মনিবেদনের নেপথ্যে তাঁর বড় ভাইয়ের প্রেরণা ও সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তিনি অত্যন্ত আনন্দের সাথে নিজের আয়ের একটি অংশ দিয়ে হংসরাজের পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে সম্মত হন। প্রকৃতপক্ষে, এটি ছিল একটি মহৎ লক্ষ্যের জন্য আত্মবলিদানেরই সমতুল্য। তবুও, এটি সংগঠনকর্তাদের অত্যন্ত উৎসাহিত করেছিল এবং ডি.এ.ভি. হাই স্কুল ও কলেজ স্থাপন করার স্বপ্ন সত্যি হয়েছিল।

মহাত্মা হংসরাজ অত্যন্ত সাদাসিধে ও সরল জীবনযাপন করতেন। তাঁর বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার সুবর্ণ সুযোগ আমি অনেকবার পেয়েছিলাম।

তিনি কাঠের চারপায় বা খাটিয়ার ওপর বসতেন এবং যারা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, তারা মেঝের ওপর বিছানো চাদরে বসতেন।

মহাত্মাজির নির্দেশনায় কাজ করার সৌভাগ্য আমার তিনবার হয়েছিল। ষোলো বছরেরও কম অল্প বয়সে, নিজের ক্লাসের তিন বন্ধুর সাথে আমি আর্য প্রাদেশিক প্রতিনিধি সভা দ্বারা সংগঠিত দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সাহায্যের জন্য উত্তরাখণ্ডে সেবামূলক কাজ করেছিলাম। যখন মহাত্মা হংসরাজ সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানতে পারলেন যে গাড়োয়ালে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, তখন তিনি আর্য সমাজীদের উদ্দেশ্যে সাহায্যের আবেদন জানান, যা কেবলমাত্র আমাদের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই আবেদনের খুব ভালো প্রভাব পড়েছিল। অধিকাংশ আর্য সমাজীই মধ্যবিত্ত আয়ের মানুষ ছিলেন। মাত্র কয়েকজন ব্যক্তিই এক হাজার বা তার বেশি অর্থ দান করেছিলেন, কিন্তু মহাত্মাজির দ্বারা দেশের কোণে কোণে থেকে পাঠানো শত শত মানি অর্ডার (ধনাদেশ)-এ স্বাক্ষর করতে দেখা এক অনুপ্রেরণামূলক দৃশ্য ছিল। সেই কিশোর বয়সে সমাজসেবার এটি ছিল আমার কাছে এক বহুমূল্য অভিজ্ঞতা।

১৯২০ সালে উড়িষ্যা প্রদেশে ঘোর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। মহাত্মা হংসরাজ পুনরায় আর্য প্রাদেশিক প্রতিনিধি সভার মাধ্যমে বড় স্তরে সাহায্য কার্যের আয়োজন করেন। জগন্নাথপুরীর কাছে সখী গোপাল-এ আর্য সমাজীদের সাহায্য কেন্দ্রটি অবস্থিত ছিল। আমি সেখানে শ্রী মোহন লালের সাথে কাজ করেছিলাম। তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত সমর্পিত এবং উৎসাহী কর্মী। তিনি পরবর্তীকালে লালা লাজপত রায়ের “সার্ভেন্টস অফ পিপল সোসাইটি”-র আজীবন সদস্য হয়েছিলেন। তিনি যে সমর্পণ ও আত্মত্যাগের সঙ্গে নিজের কর্তব্য পালন করতেন, তা আমি কখনও ভুলতে পারব না। সেখানেই আমরা পণ্ডিত গোপবন্ধু দাসের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসি। আমাদের তাঁর গুরুকুল ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা সত্যবাদী স্কুল সম্পর্কেও জানার সুযোগ হয়েছিল। পরবর্তীতে পণ্ডিত গোপবন্ধু দাসকে উড়িষ্যার ‘বেতাজ বাদশা’ বলা হতো। আমি যখন সখী গোপালে ছিলাম, তখন আমার এক সহপাঠীর চিঠি পেয়েছিলাম। এই চিঠিতে তিনি অবহিত করেছিলেন যে, অসহযোগ আন্দোলন প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী লাহোর এসেছিলেন। তিনি লালা লাজপত রায়ের বাসভবনে অবস্থান করেছিলেন। তিনি শিক্ষার্থীদের ‘কলেজ’ এর ‘বয়কট’ করার আবেদন জানিয়েছিলেন। আমার অনেক বন্ধু ডি.এ.ভি. কলেজ ছেড়ে দিয়েছিল এবং আমিও উড়িষ্যা

থেকে ফেরার পর আর কলেজে যাইনি।

১৯২৩ সালের গ্রীষ্মকালে উত্তর প্রদেশের মলকানা রাজপুতদের মধ্যে মহান শুদ্ধি আন্দোলন শুরু হয়। মহাত্মা হংসরাজ এতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। তিনি তাঁর কেন্দ্রীয় কার্যালয় আগ্রায় স্থানান্তরিত করেন। তাঁর নেতৃত্বে পর্যাপ্ত সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক কাজ করতেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এবং আর্য সমাজের অন্যান্য নেতারাও এই আন্দোলনে পূর্ণ সহায়তা প্রদান করেছিলেন। এটি একটি আনন্দদায়ক স্মৃতি যে, আমাদের সনাতন ধর্মাবলম্বী বন্ধুরাও এতে তাদের পূর্ণ সহযোগিতা দিয়েছিলেন। বাস্তবে, তাঁদের অন্যতম প্রধান নেতা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গিরধর শর্মাও নিজের কার্যালয় আগ্রায় স্থানান্তরিত করেছিলেন যাতে তিনি মলকানা অঞ্চলের কেন্দ্র থেকে শুদ্ধি আন্দোলনে সক্রিয় সহযোগিতা দিতে পারেন। আমাকে এবং আরও কিছু স্বেচ্ছাসেবককে একটি অত্যন্ত কঠিন কাজ দেওয়া হয়েছিল। মৈনপুরী জেলায় কাপুরপুরা নামে একটি ছোট গ্রাম আছে। সেখানে একই পূর্বপুরুষের ২০টি মলকানা রাজপুত হিন্দু পরিবার এবং ২০টি মুসলমান মলকানা চৌহান রাজপুত পরিবার বসবাস করত। জাহাঙ্গীরের শাসনামলে এই গ্রামের অর্ধেক বাসিন্দাকে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করে মুসলমান করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা সেই সময় পর্যন্ত অনেক হিন্দু ঐতিহ্য বা পরম্পরা মেনে আসছিলেন। মহাত্মাজিকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে, 'চৌহান' বংশীয়রা রাজপুতদের মধ্যে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী এবং যদি এই কিছু মুসলমান চৌহান মলকানা রাজপুত পরিবারকে হিন্দু ধর্ম গ্রহণে রাজি করানো যায়, তবে শুদ্ধি আন্দোলনের ওপর এর অবশ্যই ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। কিন্তু এতে একটি গুরুতর বাধা ছিল। ওই এলাকার একজন বিশিষ্ট বাসিন্দা ঠাকুর বিশাল সিং ছিলেন সুশিক্ষিত পণ্ডিত এবং অত্যন্ত কট্টর সনাতন ধর্মাবলম্বী। তিনি শুদ্ধি আন্দোলনকে সনাতন ধর্মের সম্পূর্ণ বিরোধী বলে মনে করতেন। আমাদের সঙ্গে জেলার একজন বিশিষ্ট রাজপুত ঠাকুর দিগ্বিজয় সিং-এর সক্রিয় সহযোগিতা ছিল। আমি এবং আমার সঙ্গীরা প্রায় এক মাস ধরে মৈনপুরী জেলায় কাজ করছিলাম। আমরা ঠাকুর বিশাল সিং-এর গ্রামে যেতাম, যা প্রায় ২০ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। তাকে সন্তুষ্ট করার আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। অবশেষে তিনি এই শর্তে সম্মত হলেন যে, যদি পণ্ডিত গিরধর শর্মা স্পষ্ট 'বিজ্ঞপ্তি' দেন যে শুদ্ধি সনাতন ধর্মের বিরোধী নয়, তাহলে তিনি শুদ্ধি আন্দোলনের বিরোধিতা বন্ধ করে দেবেন। আমি তৎক্ষণাৎ আগ্রায় পৌঁছলাম এবং আমার প্রার্থনায় পণ্ডিত গিরধর শর্মা সংস্কৃত শ্লোকে একটি

বিজ্ঞপ্তি লিখে দিলেন। এতে ঠাকুর বিশাল সিং সন্তুষ্ট হলেন। এর ফলে মলকানা মুসলমান রাজপুতদের হিন্দু ধর্মে গ্রহণ করে নেওয়া হলো। সেই সময়ের মধ্যে আমি লাহোরে ফিরে এসেছিলাম। আমাকে জানানো হয়েছিল যে, হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে এই শুদ্ধিকরণ একটি মহোৎসব হিসেবে পালিত হয়েছে। এতে অনেক দিন ধরে ভজন-কীর্তন এবং পুনর্মিলন গীত গাওয়া হয়েছিল। এতে মহাত্মা হংসরাজ, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এবং উত্তরপ্রদেশের অনেক রাজা ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। একটি ছোট গ্রামের এই কয়েকটি পরিবারের শুদ্ধিকরণ অন্য এলাকার শুদ্ধি কর্মীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করেছিল।

মহাত্মা হংসরাজ দিবসের পুণ্য লগ্নে ডি.এ.ভি পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক লেখা ও চিন্তাধারার এই ছোট সংকলনটি উপস্থাপন করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। মহাত্মা জি আজ থেকে ষাট-সত্তর বছর আগে যা বলেছিলেন, তা আজও প্রাসঙ্গিক ও সার্থক। আমি আশা করি পাঠকরা তা থেকে অনুপ্রেরণা নেবেন।

— (প্রফেসর) বেদব্যাস

ওম্

আর্যদের কর্তব্য

প্রথম অত্যাবশ্যকীয় বিষয়—নিজেকে লুকিয়ে রেখো না

আর্যসমাজের উন্নতির জন্য সর্বপ্রথম যা প্রয়োজন তা হলো—প্রত্যেক আর্যসমাজী যেন অত্যন্ত গর্বের সাথে নিজেকে আর্যসমাজী হিসেবে ঘোষণা করেন। কোথাও যেন নিজের আর্যত্বকে গোপন করার চেষ্টা না করেন। কোনো প্রলোভন বা ভয়ের বশবর্তী হয়ে নিজের আর্য-পরিচয় বিসর্জন দেওয়া, আর্যসমাজের জন্য অত্যন্ত ঘাতক। পৃথিবীর যত মতবাদ আছে, সবগুলোর মধ্যেই এই বৈশিষ্ট্যটি প্রকটভাবে বিদ্যমান। যেমনটি হযরত ঈসা বলেছেন, "যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে আমাকে অস্বীকার করবে, আমি প্রলয়কালে তাকে অস্বীকার করব।" এর অন্তর্নিহিত ভাব এই যে, কোনো ব্যক্তি খ্রিস্টের অনুসারী হয়েও যদি ভয়ের কারণে নিজেকে অ-খ্রিস্টান বলে জাহির করে, তবে শেষ বিচারের দিনে খোদার দরবারে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় ঈসা তাকে চিনতে অস্বীকার করবেন; অর্থাৎ তিনি অস্বীকার করবেন যে ওই ব্যক্তি খ্রিস্টান ছিল। ফলে তাকে নরকবাস করতে হবে। একইভাবে মুসলমানদের মধ্যেও নিজ ধর্মের প্রতি অত্যন্ত কঠোর আজ্ঞা পরিলক্ষিত হয়। ইসলামে সম্ভবত সমস্ত অপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব এবং সব পাপ ক্ষমা হতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি খোদা এবং তাঁর রসূলকে অস্বীকার করে, তাকে কখনোই ক্ষমা করা হয় না। সে অবশ্যই জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হয়।

বৌদ্ধদের মধ্যেও এই রীতি ছিল যে, যখন কোনো নতুন ব্যক্তি বুদ্ধমত গ্রহণ করত, তাকে সকলের সামনে এই তিনটি বাক্য ঘোষণা করতে হতো:

(১) আমি বুদ্ধের শরণাপন্ন হচ্ছি। (২) আমি ধর্মের শরণাপন্ন হচ্ছি। (৩) আমি সংঘের শরণাপন্ন হচ্ছি। এইভাবে জনসাধারণের সামনে তাঁর স্বীকৃতি নেওয়া হতো যে তিনি বুদ্ধ-মতে দীক্ষিত হয়েছেন।

শিখদের মধ্যেও গুরু গোবিন্দ সিং শিখদের জন্য কিছু প্রত্যক্ষ চিহ্ন নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন যদিও তখন শিখদের জন্য অত্যন্ত কঠিন সময় ছিল। আজকাল যেমন সাপ মারলে পুরস্কার পাওয়া যায়, ঠিক তেমনই মুঘল শাসকদের আমলে যে ব্যক্তি কোনো শিখের মাথা কেটে নিয়ে আসত, শাসকের পক্ষ থেকে তাকে পুরস্কৃত করা হতো। এইভাবে শিখদের গাজর-মুলোর মতো কাটা হতো। এত যন্ত্রণা সত্ত্বেও গুরু শিখদের জন্য নিজস্ব বাহ্যিক ধর্মীয় চিহ্ন নির্ধারণ করা আবশ্যক বলে মনে করেছিলেন। বৈদিক ধর্মও কোনো ব্যক্তি যে বৈদিক ধর্মাবলম্বী, তা চেনার জন্য কিছু চিহ্ন নির্দিষ্ট করেছে: (১) শিখা রাখা প্রত্যেক বৈদিক ধর্মাবলম্বীর জন্য আবশ্যক, তিনি যে বর্ণেরই হোন না কেন। (২) দ্বিতীয় চিহ্ন যা বৈদিক ধর্মাবলম্বীদের জন্য নির্ধারিত, তা হলো যজ্ঞোপবীত। (৩) এছাড়া তৃতীয় একটি চিহ্ন যা আর্যদের জন্য নির্দিষ্ট, তা হলো প্রাচীন ঋষি-মুনিদের অভিবাদন পদ্ধতি, একটি শব্দ— অর্থাৎ 'নমস্তে'।[1]

অতএব, সকল মতাদর্শেই এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন নিজ মত বা বিশ্বাসকে কখনো গোপন না করে বরং বিপদের সময় বুক ফুলিয়ে সগৌরবে নিজ মত প্রকাশ করে। এই বিষয়টি যেমন অন্যান্য মতাবলম্বীদের জন্য আবশ্যক, ঠিক তেমনই আর্যসমাজীদের জন্যও আবশ্যক। যে ব্যক্তি হৃদয়ে তো আর্যসমাজী কিন্তু কোনো চাপের মুখে আর্যসমাজী পরিচয় দিতে অস্বীকার করে, সে আর্যসমাজের চরম ক্ষতি সাধন করে। এই ধরনের লোকরা সত্যিই আর্যসমাজের অনেক ক্ষতি করেছে। অতএব, হে আর্য ভ্রাতৃগণ! তোমরা কখনও নিজেদের গোপন করো না। যেখানেই তোমরা সুযোগ পাবে, সেখানেই নিজেদের এই পরিচয়ে প্রসিদ্ধ করো যে আমি আর্যসমাজী। নিজ গৃহে বলো যে আমি আর্যসমাজী। তোমার পিতা, মাতা, আত্মীয়-স্বজনদের কাছে, যেখানে তুমি কাজ করো সেই সহকর্মীদের কাছে, বন্ধুদের কাছে এবং যদি সুযোগ পাও তবে তোমার ঊর্ধ্বতন--

[1] পৃথিবীতে এমন অসাম্প্রদায়িক, বৈজ্ঞানিক এবং ভাবপূর্ণ আর কোনো অভিবাদন নেই। 'নমস্তে' করার পদ্ধতি হলো— সামান্য মাথা নত করে, হাত জোড় করে এবং হৃদয়ের কাছে হাত স্পর্শ করে এটি করা হয়। এর অন্তর্নিহিত ভাব এই যে— আমি আমার মস্তকের সমস্ত জ্ঞানশক্তি দিয়ে, বাহুর সমস্ত বল দিয়ে এবং হৃদয়ের গভীরতম সমস্ত অনুভূতি দিয়ে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি।

কর্মকর্তাদের কাছেও বলে দাও যে আমি আর্যসমাজী। তোমরা যেখানেই যাও, নিজেদের আর্যত্ব গোপন করো না! জনসমক্ষে ঘোষণা করো যে আমি আর্যসমাজী। মনে রেখো, যে ব্যক্তি সামান্য ভয়ে আর্যসমাজী হয়েও অস্বীকার করে, সে আর্যসমাজের জন্য এক কলঙ্ক এবং সে আর্যসমাজের কোনো সেবাই করতে পারে না।

আর্যদের দ্বিতীয় কর্তব্য—সন্ধ্যা-উপাসনা

আর্যদের জন্য দ্বিতীয় আবশ্যকীয় বিষয়টি হলো সন্ধ্যা ও প্রার্থনা। এই উভয়ই প্রত্যেক আর্যসমাজীর জন্য অত্যন্ত আবশ্যক। এগুলোর মাধ্যমে ধর্মীয় জীবনে প্রচুর লাভ হয়। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, সন্ধ্যা ও প্রার্থনার দ্বারা কী অর্জিত হয়? ধরা যাক, একটি জল সরবরাহ ব্যবস্থা (ওয়াটারওয়ার্কস) যার সাথে নল যুক্ত রয়েছে যা নগরের চারদিকে জল পৌঁছে দেয়, তার মাধ্যমে নগরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত জল যায়। যদি সেই নল পথের কোথাও ভেঙে যায়, তবে কী হবে? তুমি সেই নলটিকে যতই ঘোরাও না কেন, জল বের হবে না। এর কারণ কী? কারণ হলো—জলাধারের সাথে এই নলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। টেলিগ্রাফের (Telegraph) অবস্থাও ঠিক একই রকম। একজন ব্যক্তি এক স্থানে বসে হাজারো ক্রোশ দূর পর্যন্ত সংবাদ পৌঁছে দেয়। কিন্তু, যদি পথের কোথাও তার ছিঁড়ে যায় অথবা সংবাদ গ্রহণকারীকে অনেক দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়, তবে যতই শক্তি প্রয়োগ করো না কেন, তারের সংবাদ আসবে না। এর অর্থও সেই একই—তারটি তার উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

অতএব, যেভাবে নলে জল আসার জন্য এটি আবশ্যক যে সেটির সম্বন্ধ জলাধারের সাথে যুক্ত থাকা, ঠিক সেভাবেই টেলিগ্রাফের বার্তার জন্য এটি প্রয়োজনীয় যে সেটিও যেন তার উৎসের সাথে যুক্ত থাকে। অনুরূপভাবে, মানুষের মধ্যে বল, শক্তি এবং জ্ঞানের তরঙ্গ সচল এবং প্রবাহিত রাখার জন্য এটি আবশ্যক যে তার সম্বন্ধও যেন সকল শক্তির ভাণ্ডার এবং জ্ঞানের উৎস পরমাত্মার সাথে যুক্ত থাকে এবং এই সংযোগ যেন কখনও বিচ্ছিন্ন না হয়। বেদে বলা হয়েছে:

তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি। বীর্য়মসি বীর্য়ং ময়ি ধেহি॥

যজুর্বেদ ১৯/৯

'আপনি তেজস্বরূপ, আপনি বীর্যের উৎস এবং শক্তির ভাণ্ডারও আপনিই।' এইভাবে যখন আমরা আমাদের বিচারধারার মাধ্যমে পরমাত্মার সাথে নিজের সম্বন্ধ বজায় রাখব, তাঁর সাথে নিজের সম্পর্ক গড়ে নেব, তখন এর পরিণাম এই হবে যে—আমাদের মধ্যে শক্তি, বল এবং জ্ঞানের প্রবাহ আসতে থাকবে, যা প্রতিক্ষণ আমাদের প্রসন্ন রাখবে এবং আমাদের প্রফুল্ল হতে সহায়তা প্রদান করবে। পরমেশ্বরের সাথে এমন সম্বন্ধ কেবল প্রার্থনার মাধ্যমেই বজায় রাখা সম্ভব। প্রার্থনার সময় এই বিষয়টি অবশ্যই খেয়াল রাখবে যে, তোমরা পরমাত্মাকে সর্বত্র ব্যাপ্ত জেনে প্রার্থনা করবে এবং উপলব্ধি করবে যে তিনি তোমাদের প্রতিটি কথা গভীর মনোযোগসহকারে শুনছেন–যেমনটি সন্ধ্যার মন্ত্রসমূহে বলা হয়েছে।

প্রাচী দিগগ্নিরধিপতি...........

'হে ঈশ্বর! আপনি পূর্ব দিকে বিদ্যমান আছেন, আপনি পশ্চিমেও আছেন, আপনি উত্তরে আছেন এবং আপনি দক্ষিণেও আছেন। আপনি নিচেও বিদ্যমান এবং আপনি উপরেও আছেন।' এইভাবে পরমাত্মাকে সর্বব্যাপক জেনে তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করো। সেই পরমাত্মাকে অনুভব করার অভ্যাস নিরন্তর করতে থাকো যাতে এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন না হয়, বরং তা আরও দৃঢ় হয়ে তোমার জন্য অধিক আনন্দ ও সুখের কারণ হয়ে ওঠে।

প্রার্থনার অমৃতের মধ্যে বিষ মিশিও না:

পরমাত্মার কাছে প্রার্থনা করার সময় এই বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত যে, ঈর্ষা ও দ্বেষপূর্ণ প্রার্থনা কখনও গৃহীত হয় না। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো শিক্ষার্থী এমন প্রার্থনা করে যে—অমুক শিক্ষার্থী যেন ক্লাসে আমার থেকে পিছনে (নিচে) থাকে এবং আমি যেন তার উপরে উঠে যাই, তবে এই প্রার্থনা পূর্ণ হবে না। অথবা, যদি কোনো ব্যক্তি প্রার্থনা করে যে তার শত্রু ধ্বংস হয়ে যাক, তবে এই ধরনের প্রার্থনাও গৃহীত হবে না কারণ পরমাত্মার কাছে উভয়ই সমান। এই ধরনের প্রার্থনা করলে স্বয়ং নিজেরই ক্ষতি হয়। পরমাত্মার কাছে কী ধরনের প্রার্থনা করা উচিত? নিজের মনের শুদ্ধি, জ্ঞান লাভ এবং শুভ কামনার জন্য পরমাত্মার কাছে প্রার্থনা করা উচিত।

যিনি সকলের উন্নতির চিন্তা করেন, তাঁর উন্নতি কামনা করো:

প্রার্থনায় এই বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যে হে পরমেশ্বর! আর্যসমাজের উন্নতি হোক, বৈদিক ধর্মের প্রচার হোক। এতে আপনার দেশের মঙ্গল হবে। এই আর্যসমাজ পরমাত্মার আজ্ঞা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য একটি মাধ্যম (Agency)। এর যত উন্নতি হবে, সংসারে ঈশ্বরের আজ্ঞা ততটাই বৃদ্ধি পাবে (অর্থাৎ ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনের ভাব বৃদ্ধি পাবে)।

প্রার্থনা ও উপাসনার জন্য এই বিষয়টিও স্মরণযোগ্য যে প্রার্থনার জন্য সময় নির্দিষ্ট করা উচিত এবং ঠিক সেই সময়েই প্রার্থনা করা উচিত। এটি আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমাদের কোনো কাজই সময়মতো হয় না। কিন্তু যারা নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমান এবং নির্দিষ্ট সময়ে আহার করেন, তারা জানবেন যে যখন তাদের ঘুমানোর বা খাওয়ার সময় হয়, ঠিক সেই মুহূর্তেই তাদের ঘুম পায় অথবা ক্ষুধার কারণে পেটে অস্বস্তি অনুভূত হয়।। এইভাবে যদি প্রার্থনার জন্যও সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়, তবে তার পরিণাম এই হবে যে সেই নির্দিষ্ট সময়ে আমাদের মধ্যে প্রার্থনার কথাই মনে পড়বে এবং এইভাবে পরমাত্মাতে মন দ্রুত নিবিষ্ট হবে। এর বিপরীতে, যদি সময় নির্দিষ্ট করা না হয়, তবে পরিণাম এই হবে যে কিছুদিন আমাদের প্রার্থনার কথা মনেই থাকবে না এবং এইভাবে বিরতি (অবকাশ) পড়ে যাবে, যার ফলে প্রার্থনায় আর আগ্রহও থাকবে না।

প্রার্থনা কোন সময়ে করবো?

ব্রাহ্মণ-গ্রন্থসমূহে লেখা আছে যে, হবন সূর্যোদয়ের পূর্বে করা উচিত; অন্য স্থানে লেখা আছে যে, সূর্যোদয়ের পরে করা উচিত এবং তৃতীয় আরেকটি স্থানে এটিও লেখা আছে যে, সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী সময়ে করা উচিত। ঋষিরা এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়েছেন। এগুলো পড়ে মনে এই প্রশ্ন জাগে যে, এই তিনটির মধ্যে কোন মতটি সঠিক? এর উত্তরও ঋষিরা দিয়েছেন যে—প্রার্থনা ও হবন প্রভৃতি তোমরা এই সময়গুলোর মধ্যে যেকোনো সময়েই করো না কেন, কিন্তু যে সময়ে করা আরম্ভ করবে, সর্বদা সেই একই সময়েই করবে। যদি তোমরা সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রার্থনা অথবা হবন শুরু করো, তবে সেই সময়েই করো আর যদি সূর্যোদয়ের পরে অথবা মধ্যবর্তী সময়ে আরম্ভ করো, তবে সর্বদা তেমনই করতে থাকো। এর বিধি এটাই যে সন্ধ্যা ও উপাসনার জন্য সময় নির্দিষ্ট করা---

অত্যন্ত আবশ্যক এবং সেই সময়ে প্রার্থনা ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ের প্রতি চিন্তা থাকা উচিত নয়।

অতঃপর প্রার্থনা ও সন্ধ্যা শ্রদ্ধা এবং প্রেমের সাথে করা উচিত, এমন নয় যে সন্ধ্যা করতে বসলে আর পাঁচ মিনিটেই তা শেষ করে দিলে। স্বামীজি 'সত্যার্থপ্রকাশ'-এ লিখেছেন যে এক ঘণ্টা প্রাতঃকালে এবং এক ঘণ্টা সায়ংকালে প্রার্থনা করা উচিত। সন্ধ্যা করার সময় যে শব্দগুলো আমরা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করি, আমাদের হৃদয়ে সেগুলোর প্রভাব পড়া উচিত, যেমন যখন আমরা **'ভূর্ভুবঃ স্বঃ'** পাঠ করছি, তখন আমাদের মনে ঠিক তেমনই ভাবনা আসা উচিত। তাড়াহুড়োয় পাঠ করে নিলে সন্ধ্যার শব্দগুলোর হৃদয়ে কোনো প্রভাব পড়ে না।

তৃতীয় প্রয়োজনীয় বিষয়—স্বাধ্যায়

তৃতীয় যে বিষয়টি আর্যসমাজীর জীবনের জন্য আবশ্যক, তা হলো 'স্বাধ্যায়'। শাস্ত্রসমূহে স্বাধ্যায়ের মহিমা এতটাই বর্ণিত হয়েছে যে অন্য কোনো বিষয়কে এতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। 'সত্যার্থপ্রকাশ'-এ স্থানে স্থানে একথার নির্দেশ করা হয়েছে যে স্বাধ্যায় করো। এক জায়গায় এই কথাটিকে ১২ বার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। যখন কোনো ব্রহ্মচারী বিদ্যা সমাপ্ত করে আচার্যের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করেন, সেই সময় ব্রহ্মচারী সব কিছু জানা সত্ত্বেও আচার্য তাকে এই শিক্ষা অবশ্যই দেন যে স্বাধ্যায় থেকে বিমুখ হইয়ো না! স্বাধ্যায়ে প্রমাদ করবে না! এইভাবে আর্যদের জন্য স্বাধ্যায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।[1]

স্বাধ্যায়ের অশুদ্ধ অর্থ:

দুঃখের বিষয় যে, আজকাল মানুষ স্বাধ্যায়ের অশুদ্ধ বা ভুল অর্থ গ্রহণ করেছে। কোনো ব্যক্তি সারাদিন উপন্যাস পড়ে এবং মনে করে যে সে স্বাধ্যায় করেছে। কেউ কোনো

[1] মনে হয় এখানে মহাত্মা জি তৈত্তিরীয় উপনিষদের নবম অনুবাকের 'ঋতং চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ...' মন্ত্রটির দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

ইংরেজি বই পড়ে মনে করে যে সে স্বাধ্যায় করে ফেলেছে। আবার কেউ সাধারণ কোনো নৈতিক বই পড়েই স্বাধ্যায় সমাপ্ত করে দেয়। এগুলোর মধ্যে অশ্লীল উপন্যাস পাঠ করা তো একেবারেই স্বাধ্যায় নয় এবং অন্যান্য বই পড়া অত্যন্ত নিম্নস্তরের স্বাধ্যায়। শাস্ত্রে লেখা আছে যে **'পরমেশ্বরের বাণী পাঠ করাকেই স্বাধ্যায় বলে।'** অতএব, প্রত্যেক আর্যসমাজীর নিজের ঘরে বেদের গ্রন্থ রাখা উচিত এবং সেগুলো যেন আলমারিতে বন্ধ না থাকে, বরং সেগুলোর পাঠও হওয়া উচিত। যাদের সেই সৌভাগ্য নেই যে তারা বেদমন্ত্রের অর্থ বুঝতে পারবেন, তাদের জন্য স্বামীজির বেদভাষ্য উপলব্ধ আছে। তারা স্বামীজির আর্য ভাষার বেদভাষ্য থেকেই স্বাধ্যায় করুন। স্বাধ্যায়ের ক্ষেত্রে এটি প্রয়োজনীয় নয় যে, একদিনে দশ-পনেরোটি মন্ত্র পড়ে ফেলা হলো অথচ সেগুলো বোঝা গেল না বরং একটি মন্ত্র পড়া উচিত এবং তার অর্থ বোঝার চেষ্টা করা উচিত। এইভাবে সেটি বুঝে নিয়ে তারপর নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে হবে, তবেই স্বাধ্যায় থেকে লাভ হবে। কেবল পাঠমাত্র (তোতাপাখির মতো আবৃত্তি) করলে ততটা লাভ হবে না।

দ্বিতীয় পর্যায়ের স্বাধ্যায় হলো ঋষিকৃত গ্রন্থসমূহের পঠন-পাঠন, কিন্তু অশ্লীল উপন্যাস পাঠ করা অত্যন্ত ক্ষতিকর। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের এই অভ্যাস থেকে দূরে থাকা উচিত। শিক্ষার্থীদের জন্য এই ধরণের উপন্যাস পাঠ করা বিষের মতো প্রভাব ফেলে। সেই কারণে ব্রহ্মচারীদের এই প্রকারের সকল পুস্তক থেকে দূরে থাকা আবশ্যক।

চতুর্থ আবশ্যকীয় বিষয়—সৎসঙ্গ

আর্যদের জন্য চতুর্থ আবশ্যকীয় বিষয়টি হলো সৎসঙ্গ। খ্রিস্টানরা তাদের গির্জায় গিয়ে সৎসঙ্গ করে। মুসলমানরাও মসজিদে গিয়ে একত্রে নামাজ পড়ে। ঋষি দয়ানন্দও সৎসঙ্গের ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। আর্য সমাজের এই যে সাপ্তাহিক বৈঠক, এ তো এক প্রকার সৎসঙ্গই। এতে আমরা সমবেত হয়ে প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের উপদেশ শ্রবণ করি। পারস্পরিক মেলামেশার ফলে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং একে অপরকে সাহায্য করার ইচ্ছা জাগ্রত হয়। সংসারে এমন কিছু ব্যক্তিও আছেন, যারা বলেন যে-----

সৎসঙ্গের কী প্রয়োজন? মানুষ নিজের উন্নতি নিজেই করতে পারে। যদি এমন কোনো ব্যক্তি থেকে থাকেন, তবে আমি তাঁকে সাধারণ মানুষ বলে গণ্য করব না। আমি মনে করব তিনি হয়তো কোনো দেবতা অথবা ঋষি। কারণ, মানুষ অন্তত একে অপরের সাহায্য ছাড়া জীবন নির্বাহ করতে পারে না। আমরা পদে পদে অন্যের সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। আমাদের খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি সবকিছুই অন্যের সহায়তায় তৈরি হয়, তাহলে আমরা কীভাবে বলতে পারি যে আমরা অন্যের ওপর নির্ভরশীল নই?

সৎসঙ্গের বিষয়ে একটি আবশ্যকীয় নির্দেশ:

সৎসঙ্গের বিষয়ে আমাদের এই বিচার থাকা উচিত যেন আমাদের সঙ্গ সর্বদা ভালো থেকে ভালো ব্যক্তিদের সাথে হয়। বন্ধুত্ব করার সময় প্রত্যেক আর্য ভাইয়ের এই বিষয়টি মনে রাখা উচিত যে, তার বন্ধু-মণ্ডলীর মধ্যে যেন অধিক সংখ্যা আর্যসমাজীদেরই হয়। কল্পনা করুন যে, দুইজন আর্যসমাজীর মধ্যে বন্ধুত্ব আছে, যাদের মধ্যে একজনের অপর চারজন বন্ধু এমন যারা আর্যসমাজী নন। এখন, যার চারজন বন্ধু আর্যসমাজী নন এবং মাত্র একজন বন্ধু আর্যসমাজী, তার চিন্তাধারায় পরিবর্তন আসবেই। তাই এমন ব্যক্তির সাথেই বন্ধুত্ব করা উচিত, যিনি আর্যসমাজী এবং অন্যান্য ব্যক্তিদেরও আর্যসমাজী বিচারধারা সম্পন্ন করে গড়ে তোলা উচিত। আমাদের সর্বদা আর্যদের সাথেই সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত এবং ধন-সম্পদ ও প্রতিপত্তির চিন্তা কম করা উচিত।

সম্পর্ক কাদের সাথে গড়বেন:

আজকাল দেখা যায় যে, আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ আর্য ভাইয়েরা নিজেদের কন্যাদের এমন ঘরে বিয়ে দেন যেখানে স্বামী আর্যসমাজী নন। এর পরিণাম এই হয় যে, তারা নিজেরাও কষ্ট পান, কন্যার জন্যেও কষ্টের কারণ হয়ে দাড়ান এবং আর্য সমাজের জন্যও এর ফল অত্যন্ত মন্দ হয়। অতএব, নিজেদের আত্মীয়তা ও বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আর্য সমাজকেই অধিক বিবেচনায় রাখা উচিত। অন্য বংশ এবং ধন-সম্পদের চিন্তা কম করা উচিত।

পঞ্চম আবশ্যকীয় বিষয়—সংগ্রাম

প্রত্যেক আর্য ভাইয়ের জন্য পঞ্চম আবশ্যকীয় বিষয়টি হলো সংগ্রাম। সংগ্রামের অর্থ হলো লড়াই। কিন্তু লড়াইয়ের অর্থ কি একে অপরের পাগড়ি টেনে নামানো? এই লড়াই কি উচিত? আমার বক্তব্য এই ধরনের লড়াই সম্পর্কে নয়। আমার বক্তব্য এই যে, প্রত্যেক মানুষের মনে ভালো এবং মন্দ এই দুই প্রকারের বিচার উৎপন্ন হয়। শ্রেষ্ঠতম মানুষের মনেও যদি তিনি দেবতা বা ঋষি না হন, তবে কখনো না কখনো মন্দ চিন্তা এসেই যায়, আবার মন্দ থেকে মন্দতর মানুষ, যে কি না বিষয়-বাসনার গভীর নোংরা পাঁকে নিমজ্জিত, তার মনেও কখনো কখনো পবিত্র চিন্তা আসতে পারে। পার্থক্য কেবল এই যে, শ্রেষ্ঠ মানুষের মনে মন্দ চিন্তা কম আসে এবং মন্দ মানুষের মনে উত্তম চিন্তার অভাব থাকে। এই শুভ ও অশুভ চিন্তা মানবজীবনে নিরন্তর সংগ্রাম করতে থাকে। আমাদের কর্তব্য হলো এই যে, আমরা উত্তম চিন্তাগুলোকে বৃদ্ধি করব এবং মন্দ চিন্তাগুলোকে কমিয়ে ফেলার চেষ্টা করব। এরই নাম 'সংগ্রাম'। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত এই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা। তাকে প্রতিদিন নিজের চিন্তাকে পবিত্র রাখার চেষ্টা করতে হবে এবং অশুভ চিন্তাগুলো মন থেকে দূর করার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে।

ষষ্ঠ আবশ্যকীয় বিষয়—আত্মসমালোচনা

আর্য সমাজের জন্য ষষ্ঠ আবশ্যকীয় বিষয়টি হলো আত্মসমালোচনা, অর্থাৎ এই বিষয়টি খুঁজে বের করা যে আমরা কতটুকু উন্নতি করেছি, কোন স্তর পর্যন্ত ধর্মীয় জীবনে আমরা এগিয়েছি, আমাদের ধর্মীয় জীবনে কী পরিবর্তন এসেছে। এটি এই কারণে আবশ্যক যে, যদি আমরা কেবল প্রচেষ্টাই করে যাই কিন্তু আমাদের জানা না থাকে যে আমরা কতদূর উন্নতি করেছি, তবে তা থেকে আমরা লাভবান হতে পারব না। অতএব, সর্বদা নিজের একটি উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নির্ধারিত করে সেই দিকে এগিয়ে চলা উচিত। এই বিষয়গুলো একে একে প্রত্যেক আর্য সমাজীর আচরণে আনা (পালন করা) উচিত। এগুলোর যথাযথ অনুসরণ করলে তাঁদের উন্নতি দিন দিন বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে, এবং আর্যসমাজ ও বৈদিক ধর্মের জয়জয়কার হবে।

অনুপ্রেরণামূলক চিন্তাধারা

(১)

জগৎপিতার উপদেশ:

পিতার মতো কৃপাময় পরমেশ্বর সমস্ত জীবের কল্যাণ ও সকল বিদ্যা প্রাপ্তির জন্য প্রতি কল্পের শুরুতে বেদের উপদেশ প্রদান করেন। যেমন পিতা ও আচার্য নিজের পুত্র বা শিষ্যকে শিক্ষা দেন যে 'তুমি এমন করো' বা 'এমন কথা বলো', 'সত্য কথা বলো' ইত্যাদি এই শিক্ষা শুনে বালক বা শিষ্যও বলে যে আমি সত্য বলব, পিতা ও আচার্যের সেবা করব, মিথ্যা বলব না। ঠিক এইভাবেই, আচার্যরা যেভাবে শিষ্যদের উপদেশ দেন, বেদমন্ত্রের ক্ষেত্রেও তেমনটিই জানা উচিত।

কীভাবে এগিয়ে যাব:

সর্বব্যাপী পরমেশ্বর নিজের ক্ষমতার দ্বারা যজ্ঞের নিরন্তর রক্ষা করেন, এই কারণেই তিনি উত্তম গুণসমূহ প্রদানের উৎস হন। একইভাবে ঈশ্বর দিব্য গুণ-যুক্ত অগ্নিকেও সৃষ্টি করেছেন, যা উত্তম শিল্পবিদ্যার উৎপন্নকারী। সেই গুণসমূহ কেবল ধার্মিক,পরিশ্রমী এবং বিদ্বান মানুষেরাই লাভ করার যোগ্য হন।

প্রিয় নাথ! তোমাকে যেন কোনোভাবেই ভুলে না যাই:

হে সর্বদ্রষ্টা এবং সর্বব্যাপী উপাসনার যোগ্য পরমেশ্বর! আমরা সমস্ত কর্ম করার সময় এক মুহূর্তের জন্যও আপনাকে ভুলি না, এই কারণেই অধর্ম করার প্রতি আমাদের কখনো ইচ্ছা জাগে না। কারণ, যিনি সর্বজ্ঞ এবং সকলের সাক্ষী সেই পরমেশ্বর আমাদের সমস্ত কাজ দেখছেন।

সর্বদ্রষ্টা প্রভু:

হে সকলকে পর্যবেক্ষণকারী এবং সকলের মধ্যে পরিব্যাপ্ত উপাসনার যোগ্য পরমেশ্বর! আমরা সমস্ত কাজ করার সময় এক মুহূর্তের জন্যও আপনাকে ভুলি না, ফলে আমাদের মনে অধর্মের ইচ্ছা জন্মায় না; যেহেতু পরমেশ্বর সর্বজ্ঞ এবং আমাদের প্রতিটি কাজের প্রত্যক্ষ সাক্ষী তিনি আমাদের সকল কাজ দেখেন।

বিজ্ঞান বা দিব্য জ্ঞানে বিচরণকালে:

যেমন বিনাশ ও অজ্ঞানতা প্রভৃতি দোষমুক্ত পরমাত্মা নিজের অন্তর্যামী রূপের মাধ্যমে সকল জীবকে সত্যের উপদেশ এবং শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও সমগ্র জগৎকে রক্ষা করতে করতে নিজের সত্তা ও পরম আনন্দে প্রবৃত্ত থাকেন, তেমনই পরমেশ্বরের উপাসকগণ শ্রী (ঐশ্বর্য) দ্বারা আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে, উন্নতিসম্পন্ন অবস্থায় বিজ্ঞান বা দিব্য জ্ঞানে বিচরণপূর্বক পরম আনন্দরূপ বিশেষ ফলসমূহ প্রাপ্ত হন।

ঈশ্বর প্রাপ্তি:

সকল মানুষের উচিত যিনি সমগ্র কার্য-জগতের উৎপত্তির আদি কারণ, সেই পরমেশ্বরকে শুদ্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে সাক্ষাৎ বা অনুভব করা; এমনটি করা ছাড়া কেউ তাঁকে লাভ করতে পারে না।

দুর্জন দমনের আকাঙ্ক্ষা:

যে মানুষ দুষ্টদের যুদ্ধের মাধ্যমে দুর্বল করে এবং জিতেন্দ্রিয় ও বিদ্বান হয়ে জগদীশ্বরের আজ্ঞা পালন করে, সেই উত্তম ধন এবং যুদ্ধে বিজয় লাভ করে।

প্রভু কর্মফল দাতা:

হে বিদ্বান মিত্রগণ! অত্যন্ত উত্তম আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত অসংখ্য পদার্থসমূহ সৃষ্টিতে সমর্থ, দুষ্ট স্বভাবের জীবদের গ্লানি (কষ্ট) প্রদানকারী এবং শ্রেষ্ঠ জীবদের সর্ব ঐশ্বর্য প্রদানকারী পরমেশ্বরের গুণাবলি যথাযথভাবে উপদেশ করুন।

বল এবং পৌরুষ ব্যতীত:

যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ পরমেশ্বরকে নিজের ইষ্টদেব হিসেবে জ্ঞান করেও বলবান অর্থাৎ পুরুষার্থী না হয়, ততক্ষণ তাদের দুষ্ট শত্রুদের দুর্বল করার সামর্থ্যও জন্মায় না।

পরমার্থের জন্য পুরুষার্থ করো:

যাঁর সত্তার দ্বারা জগতের সকল পদার্থ বলবান হয়ে নিজ নিজ কার্যকলাপে প্রবৃত্ত থাকে, সেই সকল বল প্রভৃতি গুণ থেকে উপকার গ্রহণ করে বিশ্বের নানা প্রকার সুখ ভোগ করার জন্য আমরা পূর্ণ পুরুষার্থ করি এবং এই উদ্দেশ্যে ঈশ্বর যেন আমাদের সহায় হন এই প্রার্থনাই আমরা করি।

অপরাধ ব্যতীত কাউকে পীড়া দিও না:

কোনো মানুষ যেন অন্যায়ভাবে কোনো প্রাণীকে হত্যা করার ইচ্ছা না করে, বরং সকলে পরস্পরের সাথে মিত্রভাব বজায় রাখে, কারণ পরমেশ্বর যেমন অপরাধ ছাড়া কাউকে তিরস্কার করেন না, তেমনই সকল মানুষেরও করা উচিত।

(২)

সূর্য ও বায়ুর উপকার গ্রহণ করো:

ঈশ্বর উপদেশ দিচ্ছেন যে, মনুষ্যদের উচিত বেদমন্ত্র বিচারের মাধ্যমে সূর্য ও বায়ু প্রভৃতি পদার্থসমূহের গুণাগুণ ভালোভাবে জেনে, সকলের সুখের জন্য প্রচেষ্টার সাথে সেগুলির থেকে উপকার গ্রহণ করা।

ঈশ্বর-আজ্ঞার পালন:

যে ব্যক্তি নিজের দৃঢ়তার সাথে সত্য বিদ্যার অনুশীলন এবং নিয়ম মেনে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে, তার আত্মা থেকে অবিদ্যারূপী অন্ধকারের বিনাশ অন্তর্যামী পরমেশ্বর করে দেন, যার ফলে সেই পুরুষ ধর্ম ও পুরুষার্থকে কখনও ত্যাগ করে না।

কেবল মানুষই পরমেশ্বরকে লাভ করতে পারে:

মানুষই পরমেশ্বরকে লাভ করতে সক্ষম, কারণ তাদের স্বভাবই হলো জ্ঞানের বৃদ্ধি করা। আর ধর্মপরায়ণ, জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের স্বভাবই হলো পরমেশ্বরকে লাভ করা। সর্বোপরি, ঈশ্বরের সৃষ্ট হয়ে যে (মানুষ) নিজ নিজ স্তর বা অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকে, সে সূর্যের ন্যায় নিজের সম্মুখে তথা নিকটবর্তী লোকদের চুম্বক-পাথর যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে, তেমন আকর্ষণ করার সামর্থ্য রাখে।

ধার্মিক ও পুরুষার্থী সৎকারের যোগ্য:

ঈশ্বরের আজ্ঞা এই যে, যে সকল মানুষ পুরুষার্থী হয়ে সকলের উপকার করেন এবং ধার্মিক হন, তারাই পূর্ণ ঐশ্বর্য রক্ষা করে সর্বত্র সম্মানের যোগ্য হন।

সৃষ্টি-রচয়িতার স্তুতি:

যেমন এই সংসারে কোনো উৎকৃষ্ট বস্তুর বিশেষ রচনা দেখে তার নির্মাতার প্রশংসা করা হয়, তেমনি সংসারের প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ অতি উত্তম সূর্যাদি পদার্থসমূহ এবং তাদের বিশেষ রচনা দেখে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়। এই কারণে পরমেশ্বরের স্তুতির সমান বা তার অধিক আর কারো স্তুতি হতে পারে না।

ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও পুরুষার্থ দ্বারা সুখ বৃদ্ধি:

মনুষ্যদের উচিত ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং নিজেদের পুরুষার্থের দ্বারা সকলের আত্মা ও শরীরের সুখের জন্য বিদ্যা ও ঐশ্বর্য লাভ করা, সেগুলি রক্ষা ও উন্নতি করা এবং সত্য পথ ও উত্তম দান প্রভৃতি ধর্ম সর্বদা পালন করা। এর ফলে দারিদ্র্য ও আলস্য থেকে উৎপন্ন দুঃখের বিনাশ হয়ে উত্তম ভোগযোগ্য পদার্থের বৃদ্ধি হতে থাকে।

(৩)

বিদ্যার দ্বারা লোক আলোকিত হয়:

সকল মানুষের উচিত বিদ্যা অর্জনের পর উত্তম কর্ম দক্ষতা অর্জনে প্রবৃত্ত হওয়া। যেমন সূর্যের উত্তম প্রকাশ সংসারে বিদ্যমান, তেমনই ঈশ্বরের গুণ এবং বিদ্যার প্রকাশ সকলের কল্যাণে ব্যবহার করা উচিত।

সুখ ও গুণ-সম্পন্নতার জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা:

সকল মানুষের উচিত যে, যাবতীয় সুখ এবং শুভ গুণ প্রাপ্তির জন্য কেবল পরমেশ্বরেরই প্রার্থনা করা, অন্য কারো নয়। কারণ সেই অদ্বিতীয় সর্বমিত্র, পরম ঐশ্বর্যশালী অনন্ত শক্তিমান প্রভুরই উক্ত পদার্থসমূহ প্রদানের সামর্থ্য রয়েছে।

যাঁর গুণ ও কর্মের অন্ত নেই সেই প্রভু অনন্ত:

যখন কেউ জিজ্ঞাসা করে যে ঈশ্বর কত বড়, তখন উত্তর এই যে যাকে আকাশ প্রভৃতি বড় বড় পদার্থও নিজ সীমানায় আবদ্ধ করতে পারে না, কারণ তিনি অনন্ত, তাই সকল মানুষের উচিত সেই পরমাত্মারই সেবা করা এবং উত্তম কর্ম সম্পাদন ও শ্রেষ্ঠ বস্তু প্রাপ্তির জন্য তাঁরই প্রার্থনা করা। যখন তাঁর গুণ ও কর্মের গণনা কেউ করতে পারে না, তখন কেউ তাঁর সীমা খুঁজে পেতে সমর্থ হবে কীভাবে?

পরমেশ্বরের আজ্ঞা-পালন ও শূরবীরদের সাথে বন্ধুত্ব:

যে সকল মানুষ পরমেশ্বরের প্রতি, তাঁর আজ্ঞা পালনের প্রতি এবং শূরবীর প্রভৃতি মানুষের প্রতি নিত্য মিত্রভাব অর্থাৎ প্রীতি বজায় রাখে, তারা বলবান হয়ে কোনো মানুষের কাছে পরাজয় বা ভয় কখনোই প্রাপ্ত হয় না।

এ সবই প্রভুর প্রতাপ:

এই সংসারে ঈশ্বরসৃষ্ট সকল বস্তু প্রত্যক্ষ করে মানুষের এটাই বলা উচিত যে, সমস্ত মহিমা, কৃতজ্ঞতা ও স্থিতি কেবল ঈশ্বরের প্রতাপেই সংঘটিত হচ্ছে।

(৪)

বিদ্যুৎ ও প্রাণরূপ বায়ুর উপভোগ:

মানুষের উচিত প্রতিদিন পরমেশ্বরের উপাসনা করা এবং তাঁর আজ্ঞার অনুকূলে আচরণ করা। বিদ্যুৎ এবং প্রাণস্বরূপ বায়ুর বিদ্যা দ্বারা পদার্থসমূহকে উপভোগ করা উচিত।

সুখদাতা পরমেশ্বরের উপাসনা করো:

ঈশ্বরের মধ্যে সর্বদাই এই সামর্থ্য বিদ্যমান যে তিনি পুরুষার্থপরায়ণ ধর্মাত্মা মানুষদের তাদের কর্মানুসারে সকল কামনা পূর্ণ করেন এবং তিনিই সংসারে পরম উত্তম উত্তম পদার্থ উৎপন্ন ও ধারণ করে প্রাণীদের সুখ প্রদান করেন, তাই সকল মানুষের নিত্য সেই পরমেশ্বরেরই উপাসনা করা উচিত।

প্রভুর যজ্ঞরূপ এই সংসার:

যে কারণে ঈশ্বর সমগ্র জগত রচনা করেন, তার ফলে সমস্ত পদার্থ পরস্পরের সংযোগে বৃদ্ধি পায় এবং এই পদার্থগুলো যখন ক্রিয়াময় যজ্ঞ ও শিল্প-বিদ্যায় সুনিপুণভাবে প্রযুক্ত হয়, তখন তা মহৎ সুখ উৎপন্ন করে।

সর্বত্র ব্যাপক প্রভুকে জেনে সুখ লাভ করো:

মানুষ যেমন সর্বত্র বিস্তৃত সূর্যাদির প্রকাশ দেখতে পায়, ঠিক তেমনই সর্বত্র পরিব্যাপ্ত প্রকাশস্বরূপ পরমেশ্বরকে জেনে সুখের বিস্তার লাভ করে।

প্রভুর সৃষ্টি থেকে লাভবান হও:

যেভাবে বিদ্বান ব্যক্তিগণ পরমেশ্বরের স্তুতি করে তাঁর আজ্ঞা পালন করেন, তোমাদেরও উচিত সেই পরমেশ্বরের রচিত এই সংসার থেকে নানা প্রকার উপকার গ্রহণ করা।

প্রভুর রচনা ও বিদ্বানদের উপদেশ:

বিদ্বানদের উপদেশ ব্যতীত কোনো মানুষের পক্ষেই সৃষ্টি-বিদ্যার যথার্থ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। ঈশ্বরের সৃষ্টি প্রক্রিয়া ব্যতীত কোনো পদার্থের সাকার হওয়া সম্ভব নয়, আর এই দুই কারণ না জানলে কেউ পদার্থ থেকে উপকার গ্রহণে সক্ষম হতে পারে না।

সৃষ্টি-রচয়িতা সেই এক প্রভুই:

পরমেশ্বর এই সংসারে তিন প্রকার জগত সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ এক পৃথিবীরূপ, দ্বিতীয় অন্তরিক্ষ বা আকাশে স্থিত প্রকৃতির সূক্ষ্ম রূপ এবং তৃতীয় প্রকাশময় সূর্যাদি লোক; এই তিনটিই হচ্ছে ভিত্তিস্বরূপ। এই তিনটির মধ্যে আকাশস্থ বায়ুর আধারে যা সূক্ষ্ম কারণ-রূপে বিদ্যমান তাই পৃথিবী ও সূর্যাদি লোকসমূহকে বর্ধিত করে। আর ঈশ্বর ব্যতীত এই জগত নির্মাণে কেউই সক্ষম নয়, কারণ কারও তেমন সামর্থ্যই নেই।

যিনি সমগ্র বিশ্বকে ধারণ করে আছেন:

ঈশ্বরের ধারণ ব্যতীত কোনো পদার্থের স্থিতি সম্ভব নয়, তাঁর রক্ষা ব্যতীত কারও কোনো কর্মের সাফল্যও সম্ভব নয়।

জীব কর্মে স্বাধীন, ফলভোগে প্রভুর ব্যবস্থাধীন:

মানুষ যা কিছু পাপ বা পুণ্য করে, ঈশ্বর তাঁর ন্যায়-ব্যবস্থার মাধ্যমে তার যথাযথ ফল অবশ্যই প্রদান করেন।

সমস্ত প্রাণী পূর্বজন্মে কৃত পুণ্য ও পাপের ফল বায়ু, জল ও অগ্নি ইত্যাদি পদার্থের মাধ্যমে এই জন্মে বা পরবর্তী জন্মে অবশ্যই লাভ করে।

কোনো জড় বস্তুর উপাসনা ঈশ্বরের উপাসনা হতে পারে না:

মানুষের উচিত যিনি সকলের প্রকাশক, সমগ্র জগতের সৃষ্টিকর্তা ও রক্ষাকর্তা সেই জগদীশ্বরেরই সর্বদা উপাসনা করা, কারণ তাঁকে পরিত্যাগ করে অন্য কিছুর উপাসনার মাধ্যমে ঈশ্বরের উপাসনার ফল কখনোই লাভ করা যায় না, তাই উপাসনার বিষয়ে কোনো মানুষ যেন অন্য কোনো বস্তুকে স্থাপন না করে।

সমস্ত লোক-কে গতি প্রদানকারী স্বয়ং গতিশীল নন:

ঈশ্বরের অনন্ত সামর্থ্য থাকায় কেউ তাঁর সমকক্ষ হতে পারে না। এই ব্রহ্মাণ্ডের সব লোক চলমান, কিন্তু সেগুলোতে ব্যাপ্ত ঈশ্বর চলেন না, কারণ যিনি সর্বত্র পূর্ণ, তিনি কখনো চলমান হন না। এই ঈশ্বরের উপাসনা ব্যতীত কোনো জীবের পূর্ণ, অখণ্ড রাজ্য ও স্থায়ী সুখ লাভ সম্ভব নয়। অতএব সকল মানুষের উচিত প্রমাণযোগ্য ও অবিনশ্বর পরমেশ্বরের উপাসনা করা।

মুছে যাবে ত্রিতাপ যদি তুমি.....:

যারা ঈশ্বরের আজ্ঞা যথাযথভাবে নিত্য পালন করেন, তারাই পবিত্র এবং সকল দুঃখ বন্ধনসমূহ থেকে মুক্ত হয়ে নিরন্তর সুখ প্রাপ্ত হন।

ঈশ্বরীয় ন্যায় নিত্য ও শাশ্বত:

হে ভগবান্! জগদীশ্বর! যেমন পিতা প্রভৃতি বিদ্বান ব্যক্তি এবং রাজা ছোট-ছোট অল্পবুদ্ধি উন্মত্ত শিশুদের ওপর করুণা, ন্যায় ও শিক্ষা প্রদান করেন, তেমনি প্রভুপিতা প্রতিদিন আমাদের ন্যায়, করুণা এবং শিক্ষা প্রদান করে থাকেন।

সময়ের সদ্ব্যবহার করো:

পরমেশ্বর সর্বজ্ঞ হওয়ার কারণে যেমন সমস্ত লোক ও কালের ব্যবস্থাকে জানেন, তেমনি মানুষের উচিত দেশ ও কালের মহিমা উপলব্ধি করে এক মুহূর্ত সময়ও বৃথা নষ্ট না করা।

সকলের মঙ্গলের কামনা করো:

যেমন ধার্মিক ও পরোপকারী বিদ্বানগণ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন, জগদীশ্বর তাদের সকল দুঃখ-বন্ধন থেকে মুক্ত করে সুখ প্রদান করেন, তেমনি আমাদেরও কেন তা করা উচিত নয়!

(৫)

সকল সত্য বিদ্যার জ্ঞান অর্জন করো:

মানুষের উচিত ঈশ্বর এই সংসারে যত পদার্থ উৎপন্ন করেছেন, সেগুলো জানার জন্য বিদ্যাসমূহের চর্চা করে নিজেদের কর্ম সিদ্ধি করা।

কল্যাণময় ভাব পরিপূর্ণ হোক, অকল্যাণ দূরীভূত হোক:

মানুষের উচিত এইভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা— "হে পরমাত্মন! মানুষের মধ্যে যে দুষ্ট আচরণ অর্থাৎ কপট চলন এবং যারা আমাদের শত্রু, তাদের আপনি দূর করুন এবং আমাদের সকল প্রকার ঐশ্বর্য দান করুন।"

ঈশ্বর কৃপায় মুনি ও গুণীজনের সৎসঙ্গ:

যখন মানুষ সত্যভাব নিয়ে উত্তম পথ প্রাপ্ত করতে চায়, তখন জগদীশ্বর তাদের মধ্যে উত্তম জ্ঞান প্রকাশকারী বিদ্বানদের সঙ্গ লাভের জন্য প্রীতি ও জিজ্ঞাসা, অর্থাৎ তাদের সম্পর্কে জানার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করেন, এর ফলে তারা শ্রদ্ধাবান হয়ে বহু দূরে অবস্থানকারী সত্যবাদী যোগী বিদ্বানদের নিকট গমন করে, তাদের সৎসঙ্গ লাভ করে অভীষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন এবং ধর্মাত্মা হয়ে ওঠেন।

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সিদ্ধি:

মানুষদের উচিত যে, যিনি এই সংসারে অবিদ্যার নাশ এবং বিদ্যা দানের মাধ্যমে পরম ধনসমূহ বৃদ্ধি করেন, সেই পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন ও উপাসনার মাধ্যমে নিজেদের শরীর ও আত্মার বল নিত্য বৃদ্ধি করা। তাঁর সহায়তা ব্যতীত কোনো মানুষই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ ফল প্রাপ্ত হতে সমর্থ হতে পারে না।

মহা আশ্চর্যের বিষয়:

যেমন শ্যেন (বাজপাখি) তার পূর্বে অবস্থান করা সুখদায়ক নীড়ে অন্য স্থান থেকে উড়ে এসে পুনরায় আশ্রয় গ্রহণ করে, তেমনই মানুষ ঈশ্বরকে নমস্কার জানিয়ে, তাঁরই সৃষ্ট

এই সংসারে সূর্য প্রভৃতি লোকসমূহের দৃষ্টান্ত থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নির্ণয় করে তাঁকেই প্রাপ্ত করে, কারণ এই সংসারে যত রচিত পদার্থ আছে, তারা সকলেই রচয়িতার নিশ্চয়তা প্রদান করে। রচয়িতা ছাড়া কোনো জড় পদার্থের রচনা কখনোই সম্ভব নয়। তেমনি ঈশ্বরের সৃষ্টির ক্ষেত্রেও এই সত্য উপলব্ধি করা উচিত। এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, এমন নিশ্চয়তা পাওয়ার পরেও যারা ঈশ্বরকে অনাদর করে নাস্তিক হয়ে যায়, তাদের এই অজ্ঞান সত্যিই বিস্ময়কর!

হে প্রভু! আমাদের যেন কারো প্রতি ভয় না থাকে:

ঈশ্বর যেমন শত্রুশূন্য এবং সূর্যলোক ও যেমন মেঘমুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়, তেমনই মানুষের উচিত চোর-ডাকাত ও শত্রুদের দমন করে এবং ধনবান ধর্মাত্মাদের রক্ষা করে নিজেকে অবশ্যই শত্রুমুক্ত করা।

চরিত্র-বল ও শৌর্য থেকে সুজ্ঞান:

যেমন পরমেশ্বর সূর্যের সাথে প্রকাশ ও আকর্ষণ প্রভৃতি কর্মের বন্ধন নির্ধারণ করেছেন, তেমনই বিদ্যা, ধর্ম, ন্যায় এবং শূরবীর সৈন্যাদি উপকরণে সমৃদ্ধ ব্যক্তির হাতে পৃথিবীর রাজ্যভার অর্পণ করেছেন।

সমস্ত লোক-লোকান্তর পরিভ্রমণ করে:

যেমন সব পৃথিবী আদি লোক মনুষ্যাদি প্রাণীদের ধারণ করে, সূর্যলোক তার আকর্ষণ শক্তির দ্বারা পৃথিবী আদি লোকসমূহকে ধারণ করে এবং ঈশ্বর নিজের সত্তা দ্বারা সূর্যাদি সমস্ত লোক-লোকান্তরকে ধারণ করেন; এই নিয়মেই সমস্ত লোকের স্থিতি বজায় থাকে। এই নিয়ম ব্যতীত মহাশূন্যে কোনো অত্যন্ত ভারযুক্ত লোক বা গ্রহের পক্ষে নিজ কক্ষপথে স্থিতি থাকা সম্ভব হতো না। আর লোকসমূহের এই পরিক্রমা ছাড়া ক্ষণ, মুহূর্ত, প্রহর, দিন, রাত, পক্ষ, মাস, ঋতু এবং সম্বৎসর প্রভৃতি কালের বিভাগসমূহ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নয়।

একশ্বরবাদী হও, তবেই বিজয়ী হবে:

মানুষের উচিত কেবল এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসনাতেই সন্তুষ্ট থাকা, কারণ বিদ্বানগণ কখনোই পরমেশ্বরের স্থানে অন্য কোনো বস্তুকে উপাসনার ভাব দিয়ে গ্রহণ----

করেন না। এই কারণেই এই সংসারে তাঁদের যুদ্ধ কখনোই পরাজিত বলে প্রতীয়মান হয় না, কেননা তাঁরা ধর্মপরায়ণ হন, আর সেই জন্যই যারা ঈশ্বরের উপাসনা করে না, তারা তাঁদের পরাজিত করতে সক্ষম হয় না। কারণ যাঁদের রক্ষাকর্তা স্বয়ং ঈশ্বর, তাঁদের পরাজয় কীভাবে সম্ভব হতে পারে!

সজ্জনদের সম্মান, দুষ্টদের দমন হোক:

সকলের পূজনীয় পরমাত্মার কৃপাদৃষ্টিতে প্রজার রক্ষার্থে রাষ্ট্রের অধিকারপ্রাপ্ত সকল মানুষের উচিত সত্য আচরণের প্রসারে ধর্মাত্মাদের আনন্দ দান করা এবং দুষ্টদের শাস্তি প্রদান করা।

পূজনীয় ঈশ্বরের বৈদিক স্বরূপ:

মানুষদের উচিত যিনি বেদের উপদেশ প্রদান করেছেন, যিনি সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন, যাঁর মধ্যে পৃথিবী আদি সকল লোক অবস্থান করছে ও মুক্তি বা মোক্ষ প্রাপ্তির সময় বিদ্বানগণ (মুক্ত আত্মারা) যাঁর আশ্রয়ে নিবাস করেন, সেই পরমেশ্বরেরই উপাসনা করা উচিত, তিনি ব্যতীত অন্য কারও নয়।

(৬)

কেবল সর্বজ্ঞ ও সর্বব্যাপক প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ:

বিদ্বানদের উচিত এই জগতের রক্ষক, মোক্ষদাতা, বিদ্যা, কাম ও আনন্দ প্রদানকারী এবং উপাসনার যোগ্য পরমেশ্বরকে ত্যাগ করে অন্য কাউকে ঈশ্বর জ্ঞান করে আশ্রয় না করা।

সকলের কর্মের সাক্ষী সর্বজ্ঞ প্রভু:

যেহেতু ঈশ্বর সর্বত্র ব্যাপ্ত, সকলের আত্মার অন্তর্যামী এবং সকলের কর্মের সাক্ষী; সেই কারণে একমাত্র তিনিই সকল সজ্জন ব্যক্তির নিত্য উপাসনার যোগ্য।

কর্মের যথাযথ ফল দাতা:

যিনি সূর্যাদি লোকসমূহ নির্মাণ করেছেন ও যিনি সকল জীবের পাপ-পুণ্য প্রত্যক্ষ করে তাদের সুখ-দুঃখরূপ ফল প্রদান করেন, তিনিই সকলের প্রকৃত ন্যায়কারী রাজা, এটি সকল মানুষের জানা উচিত।

ঈশ্বরের উপাসনা ও বিদ্বানদের সৎসঙ্গ:

নিশ্চিতভাবে পরমেশ্বর অথবা বিদ্বান মানুষের সঙ্গ ব্যতীত কোনো মানুষই নিজের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূর্ণ করতে সমর্থ হয় না, অতএব ঈশ্বরের উপাসনা এবং বিদ্বানদের সৎসঙ্গের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য সম্পাদন করা উচিত।

মহাত্মা জির কিছু অমৃত উপদেশ

মহাত্মা হংসরাজ
(১৮৬৪-১৯৩৮)

১. অপরাধ ব্যতীত কাউকে পীড়া দিবে না।

২. ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও পুরুষার্থ দ্বারা সুখ বৃদ্ধি করো।

৩. সুখ ও গুণ–সম্পন্নতার জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করো।

৪. কোনো জড় বস্তুর উপাসনা ঈশ্বরের উপাসনা হতে পারে না।

৫. যিনি সকলের উন্নতির চিন্তা করেন, তাঁর উন্নতি কামনা করো।

৬. সমস্ত লোক–কে গতি প্রদানকারী স্বয়ং গতিশীল নন।

৭. প্রার্থনার অমৃতের মধ্যে বিষ মিশিও না।

৮. সকলের মঙ্গলের কামনা করো।

VEDIC QUEST

VEDIC QUEST সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে উপরে দেওয়া QR কোডটি স্ক্যান করুন।